শূদ্র—এই শ্রেণীবিন্যাসে চিহ্নিত করা হয়। মুশকিল হল, চতুর্বর্ণের মধ্যে এই ত্রিগুণ খোঁজা যেতেই পারে। কিন্তু গোটা জনসমষ্টিকে এধরনের শ্রেণীবিন্যাসে কী করে ভাগ করা সম্ভব, তা বোঝা কঠিন।

বর্ণসংক্রান্ত তৃতীয় তত্ত্বে জাতিসত্তাগুলির মিশ্রণ, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের মানুষের জন্য সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করার প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার কোনও একটিই এককভাবে বর্ণের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। হিন্দু সমাজ বিবর্তনের আদি পর্বে, অর্থাৎ বৈদিক যুগে জাতি এবং বর্ণ (শরীরের বর্ণ বা গায়ের রঙ) গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজের পূর্ণ বিকশিত আকারে এই বর্ণ নিতান্তই মনগড়া মাপকাঠিতে পরিণত হয়। তখন আর তা জৈবিক বাস্তব রইল না। আর্যকরণ (Aryanization) অবশ্যই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফল। কিন্তু এই যোগাযোগ মোটেই একতরফা দাতা-গ্রহীতার প্রক্রিয়া ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অনার্য আচার-সংস্কার, যা ব্রাত্য বলে বর্জিত ছিল, পরে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আর্যসমাজের আচার-বিশ্বাস, জীবনদর্শন ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রক্রিয়ার উপরেও প্রভাব ফেলেছিল। আর্যসমাজের প্রসারণশীল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব আচার বিশ্বাস সমেত জায়গা করে দেওয়া শুরু হয়েছিল। তারা আর্যসমাজে এসে কিছু কিছু নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণ করে ঠিকই, সেইসঙ্গে কিছু পুরনো আচার-বিশ্বাস, সংস্কারও আঁকড়ে ধরে রাখে। সব মিলিয়ে ওই সব নতুন জায়গা পাওয়া জনগোষ্ঠীগুলিই বৃহত্তর হিন্দুসমাজে তাদের প্রভাব ফেলতে শুরু করে। আর্যসমাজের পূর্ণ বিকাশের আগে থেকেই এদেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পেশা-কেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উপযুক্ত মর্যাদা ও আচারবিধি নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদেরও সমাজে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল।

জাতি

জাতি অর্থে caste শব্দটি খুবই বিভ্রান্তিকর। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন অর্থ বোঝাতে এই শব্দটি নানা সময় ব্যবহার করা হয়। যে গোষ্ঠীর মানুষজন নিজেদের মধ্যেই বিবাহসম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখে, অর্থাৎ অন্তর্বিবাহ করে, সমাজে যাদের জন্য আচারবিধিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে ঐতিহ্য মেনে নিজেদের গোষ্ঠীর পেশায় যুক্ত থাকে, তাদের একটি 'জাতি' বা জাত হিসাবেই অভিহিত করা উচিত। তবে এব্যাপারে দুটি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। প্রথমত, তিন উচ্চবর্ণকে তাদের জাতিবাচক নামেই অভিহিত করা যেতে পারে। যদিও জাতি আসলে বর্ণের

Scanned with CamScanner

উপবিভাগ মাত্র। দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু জাতি-গুচ্ছের একটিই নাম থাকে, শুধু নামের আগে-পিছে অতিরিক্ত পরিচয় যোগ করে ওই জাতি-গুচ্ছের অন্তর্গত নির্দিষ্ট জাতিটিকে সনাক্ত করা হয়। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা স্ববর্ণে বিবাহ করে, এমন বেশ কয়েকটি জাতি-তে বিভক্ত। যেমন, কান্যকুব্জ, সয়যুপাড়িন, গৌড় ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রে তারা দেশস্থ, কোকনস্থ, কারখাড়ে ও সারস্বত গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণদের প্রধান গোষ্ঠীগুলির নাম আয়েঙ্গার ও আয়ার। এই জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও আবার একাধিক ছোট ছোট উপগোষ্ঠী তাদের তাদের আলাদা আলাদা পরিচয় সহ থাকতে পারে। এধরনের উপগোষ্ঠীও আবার নানা ধরনের হয়। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের যেমন 'বিশওয়াস' নামে আলাদা একটা পরিচয় দেওয়া হয়। বিশ, অর্থাৎ কুড়ি সংখ্যা থেকে এই বিশেষণটি এসেছে। এক থেকে বিশ পর্যন্ত গুণের মাপকাঠিতে যে যত গুণের অধিকারী, কান্যকুব্জ সমাজে তার পদমর্যাদা ও অবস্থান তত উঁচুতে। সমাজের যে উপগোষ্ঠী বিশটি গুণের অধিকারী, স্বভাবতই তারা সমাজের শীর্ষস্থানে জায়গা পায়। অন্যরা 'বিশওয়াস'-এর মাপকাঠিতে নিজেদের অবস্থানের নিরিখে তুলামূল্য সামাজিক মর্যাদা পায়। বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে ওই গোষ্ঠীর কিছু মানুষ দেখা যায়, যাদের মধ্যে 'বিশওয়াস'-এর আঠারো বা বিশ নম্বর নিয়ে পুরনো গর্বের রেশ ভালভাবেই রয়েছে। সরযুপাড়িন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন উপগোষ্ঠী আচার-বিচারে কতটা শুদ্ধতা বজায় রেখে চলে, সেই হিসাবে ভাগাভাগি রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদা বেশি 'পংক্তিপবন' গোষ্ঠীর। সামাজিক অনুষ্ঠানে এই গোষ্ঠীর মানুষ অন্য ব্রাহ্মণদের থেকেও আলাদা আসনে বসে ভোজন করে। সরযুপাড়িন গোষ্ঠীভুক্ত অপেক্ষাকৃত কম 'শুদ্ধ' জাতের মানুষদের তাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে বসার অধিকার নেই। এখনকার তরুণ প্রজন্ম এইসব আচারের কঠোর বিধিনিষেধ মেনে চলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু একাংশের মনে এখনও এই রীতির মধুর স্মৃতি ভালভাবেই রয়েছে। এইসব গোষ্ঠীর অন্তর্বিভাগের আরও একটি বিশেষত্ব, যাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি, তারা ইচ্ছা করলে নিচের তলার মেয়েদের বিয়ে করতে পারে। নিজেদের সমমর্যাদাসম্পন্ন ঘরের মেয়ে পাওয়া না গেলে তখন তারা এটা করে থাকে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তারা নিজেদের পরিবারের মেয়ের বিয়ে অপেক্ষাকৃত নিচুস্তরের পরিবারে দেয় না। উচ্চবর্ণ ছাড়াও, অর্থাৎ যারা দ্বিজ নয়, সেরকম কিছু জাতিগোষ্ঠীর সমষ্টির ক্ষেত্রেও জাতিবাচক পরিচয় ব্যবহার করতে দেখা যায়। সবর্ণ বা অন্তর্বিবাহ রীতি আছে, এমন একাধিক গোষ্ঠীর সমন্বয়েই এই জাতিসমষ্টিগুলি তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পর্বতের 'বাদাগা'দের নিজস্ব জাতিবাচক নাম আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও একাধিক জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, যারা অন্তর্বিবাহ মেনে চলে। এই প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীরই নিজস্ব নাম ও পরিচয় আছে। মহারাষ্ট্রের কুনবিস, গুজরাতের পাতিদার ও বারিয়া গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলে রাখাল ও জল-বহনকারীরা

Scanned with CamScanner

রাউত নামে পরিচিত। কিন্তু তাদের মধ্যেও কনোজিয়া, মেরিয়া, কোসারিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি এবং সম্ভবত আরও অনেক উপগোষ্ঠী রয়েছে, এবং তারা প্রত্যেকেই অন্তর্বিবাহ রীতি মেনে চলে। নাপিত, ধোপা, স্বর্ণকার, কর্মকার ও কুম্ভকার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এরকম একাধিক উপগোষ্ঠী দেখা যায়।

জাতি বিষয়ে এই সরলীকৃত ব্যাখ্যাও যথেষ্ট জটিল মনে হতেই পারে। কিন্তু এই জটিলতা এড়ানর উপায় নেই। কারণ, বাস্তব সমাজচিত্রটি আরও অনেক জটিল। ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও আচার সংস্কারের সমাবেশ ঘটায় তার মধ্যে একটি সার্বিক অথচ পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জস কাঠামো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পেলেও সেই কাঠামোর সবধরণের সামাজিক উপাদান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে যুক্তিযুক্তভাবে মেলানো আরও কঠিন। এই অবস্থায়, বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য একটি ত্রি-স্তর কাঠামোর কল্পনা করা যেতে পারে। একেবারে উপরতলায় থাকবে স্বীকৃত চার বর্ণ এবং স্বীকৃতি না-পাওয়া আর একটি বর্ণ প্রতিটি বর্ণের ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে পাওয়া সামাজিক অবস্থান ও সমমর্যাদাসম্পন্নদের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই সামাজিক আচার-সংস্কারের অধিকার থাকছে। মাঝখানের স্তরে থাকছে জাতিগুচ্ছ, তাদের জাতিবাচক নাম-পরিচয় সহ। তবে এই জাতিগুচ্ছগুলি একাধিক জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত, যারা অন্তর্বিবাহ মেনে চলে। একেবারে নিচের তলায় থাকছে সবর্ণ বা অন্তর্বিবাহ মেনে চলা জাতিগোষ্ঠী। যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বিপরীতে শুধু শ্রেণী বিভাজনই চিহ্নিত করে না, বিভিন্ন গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীর সামাজিক আচারবিধিও নির্দিষ্ট করে দেয়। একই সঙ্গে গোষ্ঠীগুলির এই শ্রেণীবিভাজন সামাজিক কাঠামোর কার্যকরী একক হিসবেও চিহ্নিত হয়।

এই আলোচনার পরে এখন 'জাতি'র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে—

(ক) অন্তর্বিবাহ মেনে চলে এমন জনগোষ্ঠীই জাতি।

(খ) জাতগুলি পদমর্যাদার দিক থেকে উচ্চ-নীচ নানা স্তরে বিন্যস্ত।

(গ) প্রতিটি জাতিরই জাত-পেশা নির্দিষ্ট রয়েছে।

(ঘ) কোন জাত কতটা 'শুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ', তার উপরেই জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক আদান প্রদানের সম্ভাবনা নির্ভর করে।

(ঙ) যে কোনও জাতিরই প্রতিটি সদস্য মোটামুটিভাবে একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অংশীদার। অর্থাৎ, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ যে সব প্রচলিত চিন্তাধারা ও আচরণ অনুসরণ করে, এমন কি বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার সংস্কার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন—এসবেরই উত্তরাধিকার জাতি-সদস্যদের উপর বর্তায়। এই উত্তরাধিকার প্রতিটি জাতির এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে, জন্মসূত্রে নয়।

Scanned with CamScanner

(চ) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিগুলি নিজের নিজের গ্রামের অভ্যন্তরে এবং বহু গ্রামের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সাময়িক বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রেও তা কাজে লাগে।

জাতির এই বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি মোটামুটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তবে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই কিছু অনুমোদিত ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এমনিতে জাতি মাত্রই সবর্ণ বা অন্তর্বিবাহের রীতি মানলেও নিচু তলার কিছু জাতের ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটতে দেখা যায়। তারা অন্য জাতের স্ত্রী-পুরুষকে বিবাহসূত্রে স্বজাতিভুক্ত করে নেয়। অন্য জাতের সদস্যের সঙ্গে বিবাহসঞ্জাত সন্তানও সহজেই জাতি-সদস্যের স্বীকৃতি পায়। এমনকি কয়েকটি উচ্চবর্ণের জাতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তারা সবর্ণের চাইতে কিছুটা নিচুস্তরের সমাজ থেকে মেয়েদের বিয়ে করে আনছে। তাদের সন্তানেরও কোনও কলঙ্ক হয় না, এবং তারা জাতি-সদস্য হিসাবেই গৃহীত হয়। এমনিতে সমাজে অবস্থানের উঁচু-নিচু ভেদ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এধরনের সামাজিক মর্যাদা তেমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন উচ্চবর্ণের জাতিই সমাজে নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদার আসন দাবি করে এসেছে, এবং অন্যদের দাবির ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি আরও বেশি। বহু শূদ্র জাতিই সমাজে তাদের অবস্থানকে আরও মর্যাদাপূর্ণ করার প্রচেষ্টায় নিজেদের অতীতকে গৌরবান্বিত দেখাতে নতুন নতুন কিংবদন্তী তৈরি করেছে। উপবীত ধারণের অধিকারের জন্য এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সমাজকর্তাদের 'সন্তুষ্ট' করতে পারলে সেই অধিকারও তারা পেয়ে যায়। অস্পৃশ্য জাতিগুলির নিজেদের মধ্যেও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের মালা সম্প্রদায় মাদিগা-দের চাইতে নিজেদেব উঁচু মনে করে। মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায় নিজেদের অন্য দলিত জাত ধেড়, মাঙ্গ প্রভৃতির চাইতে উঁচুতে মনে করে। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চামার সম্প্রদায়কে আবার তফসিলভুক্ত জনজাতির মধ্যে উপরের দিকে জায়গা দেওয়া হয়।

সমাজে উঁচু-নিচু অবস্থানের তারতম্যের সঙ্গে পেশার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আচার-সংস্কারগত পার্থক্য ছাড়াও সাময়িক দূরত্ব বজায় রাখাও স্বীকৃত রীতি। একই ব্যবস্থা বর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রযোজ্য। তবে কে কতটা 'শুদ্ধ' তা জন্মসূত্রেই অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। মোটামুটি নিয়ম হল, 'শুদ্ধ' ও 'মহৎ' পেশায় যুক্ত জাতি সমাজে উঁচু মর্যাদার আসন পাবে। 'অশুচি' এবং কলুষিত পেশার মানুষ সমাজের নিচের তলায় জায়গা পাবে। জ্ঞানচর্চা, বিদ্যাদান ও পূজার্চনা ইত্যাদি 'পবিত্র ও মহৎ' পেশা, তাই ব্রাহ্মণ সমাজ সর্বোচ্চ সম্মানের

Scanned with CamScanner

অধিকারী। চর্মকারের পেশা, জঞ্জাল সাফাই, মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজকে 'অশুচি' ও 'কলুষিত' বলে ধরা হয়। তাই ওই সব পেশায় নিযুক্ত জাতির স্থান হয়েছে সমাজের সবচেয়ে নিচুতলায়। এই শুচি-অশুচি, পবিত্র-অপবিত্র ইত্যাদি ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির আন্তঃসম্পর্কেও ছায়া ফেলেছে। শুচি-অশুচি, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা হিন্দু মানসিকতারই অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবে এখন সমাজ বদলাতে শুরু করেছে। বাস্তব পরিস্থিতি সনাতন-পরম্পরা থেকে মানুষকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি সাধারণ রীতির কথা বলা যায়। যে জাতির অবস্থান সমাজে যত উঁচুতে, 'শুদ্ধতা' বজায় রাখা ও ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার জন্য তাদের আচার-সংস্কার তত জটিল। জাত-এর ক্ষেত্রে ছোঁয়াছুঁয়ি জনিত দোষ ঘটে দু'ভাবে—একত্র ভোজন ও শারীরিক সংস্পর্শ থেকে। খাওয়ার বেলায় ছোঁয়াছুঁয়ির দোষবিচারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—কোন্ খাবার? কোন্ জাতের মানুষ রান্না করেছে? কোন্ জাতের মানুষের সঙ্গে একত্রে বসে তা খাওয়া হচ্ছে? ইত্যাদি। গুণবিচারে সবচেয়ে উন্নত বা শুদ্ধ আহার হল সাত্ত্বিক আহার—ফলমূল, দুধ এবং সাধারণভাবে নিরামিষ খাবার। এমনকি নিচু জাতের মানুষের এনে দেওয়া ফল খেলে ব্রাহ্মণেরও দোষ হয় না। তবে খাওয়ার আগে সেই ফল, অপেক্ষাকৃত কম-নিচু জাতের মানুষের এনে দেওয়া জলে ধুয়ে নিতে হবে, এবং পরিষ্কার কাপড়ে তা মুছে নিতে হবে। দুধ ও দইয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা আছে, কারণ দুটোই তরল পদার্থ এবং উভয় ক্ষেত্রেই অশুচি হাতে আনা জল মেশানোর সুযোগ রয়েছে। এসব কারণেই বেশির ভাগ গ্রামে বর্ণহিন্দু ও নিচুজাতের মানুষের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাতে আলাদা আলাদা কুয়োর ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কুয়ো একটা থাকে, তাহলে শুধুমাত্র উঁচুজাতের মানুষ তা ব্যবহার করার অধিকারী। নিচুজাতের মানুষ সেখান থেকে জল নিতে পারে না। পরম্পরাগত পেশা হিসাবে জলবাহকের কাজটা চতুর্থবর্ণের অর্থাৎ শূদ্র জাতির মানুষ করে। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব বর্ণের মানুষই সাধারণত তাদের ছোঁয়া জল ব্যবহার করে থাকে। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে শুদ্ধতার মাপকাঠিতে সমমর্যাদাভুক্ত মানুষ, তাও শুদ্ধাচারে জল আনলে তবেই তা ব্যবহারের যোগ্য বিবেচিত হবে।

রাজসিক ও তামসিক আহারের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। অঞ্চল ভেদে দুইয়ের সংজ্ঞারও অনেক পার্থক্য হতে দেখা যায়। হরিণের মাংস রাজসিক আহার। তেমনই, দ্রাক্ষারসসঞ্জাত মদিরা বা অন্য যে সব ফল 'অশুদ্ধ' নয়, তাদের রস থেকে তৈরি মদিরাও রাজসিক পানীয়। পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সব্জি তামসিক আহার্যতালিকায় রয়েছে। মহিষ ও শূকর মাংস একই কারণে তামসিক। কিন্তু বুনো শুয়োর ও বন মোরগের মাংস গৃহপালিত শুয়োর ও মুরগির তুলনায় কিছুটা শুদ্ধাহার বলে মনে করা হয়।

Scanned with CamScanner

সাধারণত ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য জাতের মানুষই সাত্ত্বিক আহার করে বলে মনে করা হলেও এর অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কাশ্মীরি পণ্ডিত, মহারাষ্ট্রের সারস্বত এবং বাংলা ও ওড়িশার ব্রাহ্মণরা মাছ-মাংস খেয়ে থাকেন। ক্ষত্রিয়ের আহার হল রাজসিক, এবং শূদ্রের তামসিক। চতুর্বর্ণেরও নিচে যারা, সেই সব জাত নিষিদ্ধ খাবারও খেতে পারে।

খাবার 'কাঁচা' না 'পাকা', তা নিয়েও 'শুদ্ধ' জাতগুলির ভেদ-বিচার আছে। 'কাঁচা' খাবার তৈরির ক্ষেত্রে জল লাগে। 'পাকা' খাবার রান্নায় দরকার হয় তেল, তবে ঘি হলে আরও ভাল। পাকা খাবারের বেলায়, যেমন আটা-ময়দা মাখতে জলের বদলে দুধ দিতে হবে। পরমান্ন বা পায়েস রান্না করতে হলে চাল-কে আগে ঘি দিয়ে সামান্য ভেজে নিতে হবে। 'কাঁচা' খাবার যে কোনও জাতের মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করা যায় না। শুধু তুলনায় উঁচু জাতের মানুষের কাছ থেকেই নেওয়া চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমমর্যাদার জাত হলেও চলে। 'পাকা' খাবারের ক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা শিথিল। তবে 'শুদ্ধ' জাতের মানুষ কোনও অবস্থাতেই ধোপা-নাপিত ইত্যাদি 'অশুদ্ধ' শূদ্রের দেওয়া পাকা খাবারও খাবে না। আর 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত জাতের ছোঁয়া কোনও খাবারই চার বর্ণের কোন জাত-ই খায় না।

বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে পংক্তি ভোজনের নিয়মটিও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর ভাবে জটিল। একই জাতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেও পংক্তি ভোজনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। কানাকুব্জের ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বলা হয়, তিন কনৌজিয়া— তেরহা চুলাহ। কিছুটা অতিশয়োক্তি হলেও ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা কতটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যেতে পারে, এটা তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। নিয়মের কড়াকড়ি 'পাকা' খাবারের চাইতে 'কাঁচা' খাবারের বেলায় অনেক বেশি। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে কোন্ জাত কার সঙ্গে কতটা দূরত্ব বজায় রাখে, তা বিয়ে-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণেই বোঝা যায়। এমনকি কোনও সামাজিক 'অপরাধ' থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আয়োজিত সামাজিক ভোজ অনুষ্ঠানেও এটা চোখে পড়ে। এই সব সামাজিক ভোজে নিমন্ত্রিতদের জাতি-বর্ণ-সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী আলাদা আলাদা পংক্তি ভোজনে বসার ব্যবস্থা থেকেই অঞ্চল বিশেষের কে উঁচু জাত, কে নিচু জাত তা বোঝা যায়।

আহারের মতোই নিচু জাতের সঙ্গে শারীরিক স্পর্শ দোষ বাঁচিয়ে চলারও বিধান রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই অস্পৃশ্যতার উৎকট নমুনা দেখা যায়। সেখানে নিচু জাতের মানুষকে চোখে দেখাটাই স্পর্শ দোষ বলে ধরা হত। কিছু 'অস্পৃশ্য' জাতের মানুষের ছায়া মাড়ালেও পাপ হত। তামিলনাড়ু ও কেরলে একসময় ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার এই আকার নিয়েছিল। কেরলের 'তাইয়ান' (তাড়িসংগ্রহকারী) পেশার মানুষদের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ থেকে ৩৬ পা' দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হত। 'পুলিয়ান' (চাষী)-দের

Scanned with CamScanner

দূরত্ব বজায় রাখতে হত ৯৬ পা'। অস্পৃশ্যতার সবচেয়ে প্রচলিত ও কম কড়া নিয়মটি হল, 'অস্পৃশ্য'দের উঁচু জাতের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে এবং তারা উঁচু জাতের মানুষের বাড়িতে পা দেবে না। তাদের মন্দিরে ঢোকা নিষেধ, গ্রামের বারোয়ারি কুয়ো থেকে জল নেওয়াও নিষিদ্ধ। গ্রামের বাইরে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে তাদের ঘরবসতি হবে। স্কুলে অস্পৃশ্য জাতের ছাত্রদের বসার জায়গাও অন্যদের চাইতে দূরে, ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে বসতে হত। এমনকি গ্রামের চায়ের দোকানেও তাদের চা খাওয়ার জন্য আলাদা কাপ নির্দিষ্ট থাকত, যা খাওয়ার পরে তাদেরই ধুয়ে দিতে হত। আইন করে অস্পৃশ্যতা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের চোখে উঁচু জাত নিচু জাত সবাই সমান হলেও বাস্তবে এখনও তার প্রতিফলন কম। সমাজে এখনও এধরণের দ্বেষমূলক ভেদভাব রয়েছে অনেক সময়েই তা প্রকাশ্যে না হলেও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পায়।

কোনও একটি জাতের সব মানুষের পক্ষে একই সাধারণ সংস্কৃতির শরিক হওয়ার প্রবণতা এখনকার তুলনায় অতীতেই বেশি ছিল। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য তখনও ছিল। তবে তখনকার দিনে বেশিরভাগ জাতই কোনও না কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বসবাস করত। ফলে, নিজেদের জাত-বৈশিষ্ট্য নিয়েই তারা তাদের আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে তুলত। রাজপুতরা ব্যতিক্রম। অঞ্চল ভেদে রাজপুতদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার ব্যবহারে বড় রকমের প্রভেদ দেখা যায়। এছাড়া রাজপুতরা সবর্ণের মধ্যে বিবাহরীতি মানত না। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজপুতদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থাকলেও এই একটা বিষয়ে লক্ষ্যণীয় মিল, তারা অন্য জাতের সঙ্গে বিবাহে আপত্তি করত না। বিত্ত ও শক্তির দৌলতে সমাজের কিছু অংশ এভাবে এমন কয়েকটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে, যা সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর নাগালের বাইরেই থেকে গিয়েছিল।

সামাজিক বিবাদ বা সমস্যা মেটানোর জন্য গ্রামে গ্রামে প্রায় সব জাতেরই নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। এধরণের সমস্যায় একাধিক গ্রাম জড়িয়ে পড়লেও জাত-পঞ্চায়েত তা নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা নিত। এখন এই ব্যবস্থার ভিত আলগা হয়ে এসেছে, তবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। পরে পঞ্চম পরিচ্ছেদে এনিয়ে আলোচনা করা হবে।

সামাজিক আচার-বিচার ও মেলামেশার মাপকাঠিতে আগে সমাজে বিভিন্ন জাতের যে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অবস্থান ছিল, সেই ভেদরেখাও এখন অনেকটাই মুছে এসেছে। তবে একেবারে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে জাত-পাত আবার শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় জনসমর্থন সংগঠিত করতে সামাজিক ভিত্তি দরকার। জাত-সংহতি, জাত-আনুগত্য তাই বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। তাই নির্বাচনে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে জাতপাতের রাজনীতি এখন বহুল ব্যবহৃত কৌশল। কিন্তু এখনও বেশির ভাগ নির্বাচন কেন্দ্রেই একই জাতের প্রতিনিধিদের

Scanned with CamScanner

মধ্যে ভোটের লড়াই হওয়ায় জাতপাতের অঙ্ক রাজনীতিতে কাজে আসছে না। অন্য একটি প্রবণতাও চোখে পড়ে—অপেক্ষাকৃত ধনী ও ক্ষমতাশালী জাতগুলি গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে নিজেরা জোটবদ্ধ হয়। নিচুজাতের মানুষকে এভাবে পদানত রাখতে উঁচু জাতের মানুষ তাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর জন্যই সন্ত্রাসের আশ্রয়ও নেয়। বিদ্রোহের সামান্যতম ইঙ্গিত দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা বলপ্রয়োগে দমন করা হয়। এজন্য খুন, ধর্ষণ করতেও তারা পিছ-পা নয়। সেই সঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করা—কোনটাই বাদ যায় না। গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষকে জোর করে প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করিয়ে, অথবা একেবারেই ভোট দিতে না দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সব মিলিয়ে, জাতপাতের সঙ্গে ক্ষমতার রাজনীতি মিশে যাওয়ায় দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা পরিবেশ নষ্ট হতে বসেছে।

ভারতের এই জাত-পাত নিয়ে দেশের ভিতরে ও বাইরে কম সমালোচনা হয়নি। তা সত্ত্বেও বর্ণ ও জাতপাত ব্যবস্থা টিঁকে থাকার ও নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছে। এ পর্যন্ত যত আঘাত এসেছে, এই ব্যবস্থা তা সামলে নিয়েছে। যুগ পরিবর্তনের সাথে বর্ণ ব্যবস্থাও নিজেকে সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত করে তুলেছে। যেমন, অস্পৃশ্যতা বা ছোঁয়াছুঁয়ির কড়া বিধান এখন অনেকটাই আলগা বা শিথিল হয়ে এসেছে। একই ভাবে শিথিল হয়েছে পংক্তিভোজন, জাত-পেশার বাধানিষেধও। অন্যদিকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতপাত গুরুত্বপূর্ণ নতুন ভূমিকা নিয়ে মাথা তুলেছে। তাই স্বাধীনতার 40 বছর পরেও ভারতীয় সমাজে বর্ণবিচার, জাতপাত নিয়ে নতুন করে শক্তিলাভ করছে।

আগের পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, কীভাবে এদেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকেই খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামকে এদেশের বর্ণব্যবস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামকে বর্ণ ও জাতপাতের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে হয়েছে, যা আদৌ তাদের ধর্মাচারে ছিল না। বিস্ময়জনক ভাবে এখনও এদেশের খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে ওই সব বৈশিষ্ট্যের জের বজায় রয়েছে।

খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে অবশ্যই চতুর্বর্ণের ভাগ নেই। কিন্তু ওই দুই সমাজে ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। উচ্চবর্ণ সমাজ থেকে ধর্মান্তরিতরা নিজেদের ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান, নায়ার-খ্রীষ্টান, রাজপুত বা ত্যাগী মুসলমান ইত্যাদি পরিচয়ে চিহ্নিত করে। এ বিষয়ে মণ্ডল কমিশনের (1980) মন্তব্য: "..... মানসিকতার গঠনে জাতপাত বিরাট মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনায় তা এমন ছাপ ফেলেছে, যা সহজে মোছার নয়।"

1988 সালের জানুয়ারিতে তামিলনাড়ুর বিশপদের বার্ষিক সম্মেলনের প্রতিবেদনে

Scanned with CamScanner

বলা হয়েছে, "ধর্মান্তকরণের পরেও তফসিলভুক্ত কাস্ট খ্রীষ্টানরা সমাজে সনাতন অস্পৃশ্যতার শিকার হয়ে চলেছে। ফলে, সামাজিক, শিক্ষাগত ও আর্থিক ক্ষেত্রে এখনও তারা চরমভাবে বঞ্চিত।" 1988 সালের ফেব্রুয়ারি নিজেদের মধ্যে বিতরিত এক খোলা চিঠিতে তামিলনাড়ুর ক্যাথলিক বিশপরা স্বীকার করেন, "জাতপাতের বিভেদ ও তার জেরে সামাজিক অন্যায় ও হিংসার ঘটনা খ্রীষ্টান সমাজের দৈনন্দিন জীবনেও প্রতিনিয়ত ঘটছে। আমরা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত, কিন্তু যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গেই পরিস্থিতি মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছি।" ভারতীয় চার্চ এখন স্বীকার করছে যে এদেশের এক কোটি 90 লক্ষ খ্রীষ্টানের 60 শতাংশকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্রীষ্টান বা তার চাইতেও নিচু স্তরের ধরে নিয়ে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে তফসিল সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান সমাজে প্রবেশ করলে তাদের আলাদা জনবসতিতে থাকতে বাধ্য করা হয়। গির্জাতেও তাদের আলাদা করে দেখা হয়। সাধারণ খ্রীষ্টান সমাজ থেকে দূরে তাদের বসবাসের জন্য কলোনি স্থাপন করতে হয়। সাধারণ পুর-সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। গির্জায় প্রার্থনা করার সময় 'নিম্ন জাতের' খ্রীষ্টানদের বসার জায়গা হয় ডানদিকের সারিতে, অন্যদের থেকে আলাদা। গির্জায় উপাসনার সময় বাইবেল পাঠ বা অন্য কোনও ভাবে পাদ্রিকে সহায়তা করার ভূমিকাও তাদের দেওয়া হয় না। জন্মের পর ব্যাপটিজম বা নামকরণের সূত্রে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান, দীক্ষিত খ্রীষ্ট সমাজের পূর্ণ অধিকার লাভ ও বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিচু জাতের খ্রীষ্টানরা সবার শেষে পাদ্রির আশীর্বাদ পায়। এমনকি মূল খ্রীষ্টিয় সমাজের রাস্তা দিয়ে নিচু জাতের খ্রীষ্টানরা বিয়ের শোভাযাত্রা বা শবানুগমনও করতে পারে না। তফসিল-খ্রীষ্টানদের জন্য কবরস্থানও আলাদা। তাদের কারও মৃত্যু হলে গির্জায় ঘণ্টা বাজে না। পাদ্রিও মৃতের বাড়িতে প্রার্থনা করতে যায় না। মৃতদেহ কবর দেওয়ার আগে খ্রীষ্টিয় রীতিতে গির্জায় ধর্মীয় অন্তিম ক্রিয়ার (ফিউনারেল সার্ভিস) জন্য নিয়ে যাওয়ার অধিকারও তাদের নেই। উঁচু জাত ও নিচু জাতের খ্রীষ্টানদের মধ্যে একত্র ভোজন বা বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না। খ্রীষ্টসমাজের এই দুই 'জাত'-এর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও বিরল নয়। নিচু জাতের খ্রীষ্টানরা তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নীত করার চেষ্টায় লড়াই চালাচ্ছে। চার্চও তাতে সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত খুব সামান্য পরিবর্তনই দেখা গিয়েছে। জাতপাতের রেশ উঁচু জাতের খ্রীষ্টানদের নিজেদের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যেও থেকে গিয়েছে। এবং তাদের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে জাতপাতের এই বিচার সূক্ষ্মভাবে হলেও ছায়া ফেলে।

মুসলমান সমাজের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। মসজিদে ঢোকার অধিকার সবারই আছে, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটাও তেমন জোরাল নয়। তাহলেও বর্ণ ও জাতপাতের ভেদাভেদের মতোই মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের

সীমারেখা টানা আছে। ওই বিভেদরেখাই সমানে মর্যাদার অবস্থান ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নিষেধের গণ্ডী টেনে দিয়েছে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আসরফি ও আজলফ—ভেদাভেদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে 'শরিফ-জাত' ও 'আজলফ-জাত'-এর কথা বলেন। শরিফ-জাত অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, অনেকটা উঁচু জাতের সঙ্গে তুলনীয়। সাধারণ বংশজাত, বা নিচুজাতের সঙ্গে তুলনীয় হল আজলফ-জাত। মুসলমান সমাজে বিয়ে-শাদি, নিমন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিভেদরেখার কাজ করে। কে কোন বংশজাত, তা মুসলমান সমাজেও খেয়াল রাখা হয়। হিন্দুসমাজ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আগের মতোই তাদের জাত-পেশায় নিয়োজিত থাকে। মুঘল জমানায় সৈয়দ, শেখ, মুঘল ও পাঠান-কে প্রায়শই হিন্দুসমাজের চতুর্বর্ণ কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করা হত। দেশের কোনও কোনও প্রান্তে ধর্মান্তরিত মুসলমানকে এই চার 'বর্ণ'-এর মধ্যে কোনও একটিতে নিজেদের জায়গা করে নিতে হত। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এই রীতি ঠিক, না বেঠিক, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এখনও তা চলছে, এটাই বাস্তব। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের কন্যার বংশজাতরা সৈয়দ, তারা আরব দেশের মানুষ। কিন্তু এদেশের অনেক উচ্চবর্ণের মানুষই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পর নিজেদের সৈয়দ বলে পরিচয় দেয়। যে সব ব্রাহ্মণে মুসলমান হয়েছে, তাদের দাবি হল সম্রাট আকবরই তাদের এই স্বীকৃতি অনুমোদন করে গেছেন। পয়গম্বরের বংশোদ্ভূত না হলেও শেখরাও আরব দেশ থেকেই এসেছিল। কিন্তু এদেশে প্রথম প্রজন্মের ধর্মান্তরিত মানুষকে নিজেদের শেখ বলে পরিচয় দিতে দেখা গেছে। দিল্লির শাসক শ্রেণী, অর্থাৎ মুঘলদের অবস্থান শেখদের পরেই। মুঘলরা তুর্কী বংশোদ্ভূত। কিন্তু তুরস্কের অটোমান শাসকশ্রেণী থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে তারা নিজেদের মুঘল পরিচয়ে পরিচিত করেছিল। পাঠানরা সাধারণভাবে আফগান বংশোদ্ভূত, যদিও আফগানিস্থানের সঙ্গে অনেকেরই সামান্যতম সম্পর্কও ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পাঠান বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেনি। মুসলমান সমাজের উপরতলায় ওঠার জন্য এরকম বহু উল্লম্ফনের নজির পাওয়া যায়। 'গত বছর আমি ছিলাম জোলা, এ বছর হয়েছি শেখ, আর সামনের বছর যদি ফসল ভাল হয়, তাহলে আমি সৈয়দ হব।' একটু নিম্নরুচির হলেও এই রসিকতা থেকে সমাজে ওঠার এই প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজপুত, জাঠ ও আহির প্রভৃতি উঁচু জাতের মানুষ মুসলমান সমাজে এসেও নিজেদের পূর্ব পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান ধরে রেখেছিল। মুসলমান সমাজের জোলা, তেলি, ভাট, কালাল ও ভিস্তি প্রভৃতি সম্প্রদায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন পেশার কারণে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে জায়গা পেয়েছে। এ দিক থেকে তারা হিন্দু সমাজের পেশাভিত্তিক জাতগুলির সমতুল্য। ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ ও সমাজ সংস্কারকদের উদ্বেগের কারণ হলেও জাতপাত মুসলমান সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে। এমনকি সাম্প্রতিক মৌলবাদী উত্থানও তাকে দূর করতে পারেনি।

Scanned with CamScanner

বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ—ভারতের মাটিতেই জন্ম নেওয়া এই তিন ধর্মের সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতপাতের বিচার দেখা যায়। নয়া-বৌদ্ধরা তাদের ফেলে আসা জাত-অবস্থান থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে নি। শিখধর্মের সাম্যচেতনাও ধাক্কা খেয়েছে জাতপাত ও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের কাছে।

বর্ণব্যবস্থা ও জাতপাতের প্রভাব এতটাই বেশি যে তা হিন্দুধর্মের সীমানা অতিক্রম করে গোটা ভারতীয় সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সমাজ সংস্কারকরা অনেক চেষ্টা করেও এই প্রবণতাকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে পারেন নি।

আধুনিকতা ও সনাতনী ধারণা, এই দুই শক্তির প্রবল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এখনকার ভারতীয় সমাজ এগোচ্ছে। এই পরস্পরবিরোধী সংঘাতের বেশ কিছু অদ্ভুত ফল ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। একদিকে ভারতীয় সমাজ গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়চেতনাকে গ্রহণ করে তুলে ধরছে। অন্যদিকে, জাতপাতকেন্দ্রিক আদিম গোষ্ঠী-আনুগত্য এখনও সমাজের ভিত্তিতে শিকড় গেড়ে রয়েছে। সমাজ থেকে শোষণব্যবস্থা নির্মূল করার কোনও আন্তরিক প্রচেষ্টাই হয় নি। বরং রাজনৈতিক ফয়দার দিকে লক্ষ রেখে সনাতনী আচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার রীতি অব্যাহত। ধর্মীয় উন্মাদনা ও মৌলবাদকে কড়া হাতে দমন করার চেষ্টাই হয়নি। বর্ণ ও জাতপাতের কাঠামোয় নিহত অমানবিকতা ও বৈষম্যের কথা ভারতীয় সমাজের আবেগ ও সচেতন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে, নিন্দাও করে। কিন্তু মুখে এ কথা স্বীকার করলেও তা নির্মূল করার সত্যিকারের চেষ্টাই হয়নি। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই তফসিল জনজাতি, আদিবাসী ও অন্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ। দেশের মোট কৃষিজমির মাত্র 10 শতাংশ তাদের হাতে। গরিব মানুষ—বিশেষ করে ভূমিদাস ও একেবারে 'নিচু' পেশায় যুক্ত মানুষদের সামনে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের তেমন কোনও রাস্তাই খোলা নেই। ভূমিদাস প্রথার বিলোপ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তা অন্য ধরণের দাস প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতে এখনও 41,00,000 খাটা পায়খানা রয়েছে, যা সাফ করতে এখনও একটি বিশেষ জাতের মানুষকে মাথায় করে মলমূত্র বহন করতে হয়। বর্ণ ও জাতপাত এখন রাজনীতির আধার হওয়ায় নিচু জাতের মানুষের উপর অত্যাচার অন্য চেহারা নিয়েছে। নিচু জাত ভোটের অধিকার প্রয়োগ করে যাতে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী না হতে পারে, সেজন্য তাদের ভোট দিতেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিছু এলাকায় জাত-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে এলেও অন্যত্র তা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। ভারতীয় সমাজ, তার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এ পর্যন্ত শুধু দলিত ও দুর্বল অনগ্রসরদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছে। কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে পারেনি। সহজবোধ্য কারণেই দেখা দিচ্ছে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ। ঐতিহ্যের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার দোহাই দিয়ে শোষণ, সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায় অবিচার অব্যাহত রাখার কোনও যুক্তি নেই। বর্ণ ও জাতপাতের বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন

Scanned with CamScanner

এলেও তা নিতান্তই কম, এবং তা এসেছেও খুবই ধীরগতিতে। আইন একহাতে অনেক কিছু দিয়েছে—অস্পৃশ্যতা ও ভূমিদাস প্রথা বিলোপ, চাকুরি ও শিক্ষাব্যবস্থায় সংরক্ষণের মাধ্যমে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষকে সুযোগ দান, জাতপাতের বিচারের বাইরে বিয়ের সুযোগ ইত্যাদি। আবার আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে চরম শিথিলতা কেড়ে নিয়েছে এ সবের অনেকটাই।

Scanned with CamScanner